একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Child Characters in Anil Gharai's Novels: Social Analysis and Innovative Artistic Interpretation of Life Experiences

অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে শিশুচরিত্র : সমাজসমীক্ষা, জীবন অভিজ্ঞতার অভিনব শিল্পভাষ্য

Name of the Author: **Dr. Dinabandhu Mondal**

Affiliation: **Assistant Professor, Kabi Joydeb Mahavidyalaya - Affiliated to the University of Burdwan, WestBengal, India**

Abstract: Childhood has long been a significant thematic concern in modern Bengali literature especially during the early twentieth century. It is when writers such as Bibhutibhushan Bandopadhyay shaped a powerful tradition of child-centric narratives and this literary lineage finds a compelling continuation in the novels of Anil Gharai (1957-2014), where childhood and adolescence frequently occupy the central narrative space. Gharai's fiction presents child and adolescent characters not merely as passive figures but as expressive voices through which the author articulates both the spoken and unspoken realities of marginalized communities. Through sensitive characterization, the novelist artistically foregrounds the emotional world of children while simultaneously situating them within the broader social realities of deprivation, displacement, and inequality. In the aura of his narratives come an aesthetic picture of child-society as a part of the marginalized folk represented by the depiction of ordinary occupations and marginal professions—such as swineherds, cobblers, weavers, beggars, tramps, scavengers and small labourers—further contributes to a realistic portrayal of everyday rural existence. The children characters presented through Anil Gharai's narratives are not a whimsical exposition; but an arrangement of his deep and empathetic survey of the then penury-oriented rural society.

The impeccable child characters such as Nonai in "Nunbari" (1991), Arjun in "Mukuler Gondho" (1993), Logon in "Banabasi" (1994), Kusuma in "Dourbogarar Upakhyan" (1997), Babla and Bele Dutta in "Jonmodaag" (1999), the depiction of Kakmara children in "Neel Duhkhher Chobi" (2001), Bhanua and Kusum in "Pata Othar Din" (2002) are exquisitely unrivalled in the arena of history of Bengali Literature who embody the emotional and ethical core of his narratives. Through these character portrayals, Gharai constructs a powerful literary archive of marginal childhoods that reflects the realities of social inequality while also emphasizing human compassion and endurance. His fiction therefore represents an important contribution to the tradition of social realism in Bengali literature, highlighting the ethical responsibility of literature to give voice to the unheard and marginalized.

Keywords: Social realism, childhood studies, marginality, rural Bengal, environmental sensibility, Bengali fiction, poverty, empathy.

অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে শিশুচরিত্র : সমাজসমীক্ষা, জীবন অভিজ্ঞতার অভিনব শিল্পভাষ্য

ড. দীনবন্ধু মন্ডল

উপন্যাস নির্মাণশিল্পের একটা বড়ো দিক চরিত্রসৃষ্টি। চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়। লেখক যা কিছু বলতে চান, যা দেখাতে চান তার সাফল্য, ব্যর্থতা, দোষ, গুণ প্রভৃতি সমস্ত কিছু চরিত্রের নির্মাণের উপর ভর করে থাকে। কথাকার অনিল ঘড়াইয়ের (১৯৫৭-২০১৪) উপন্যাস এই ঘরানার বাইরে থাকেনি। তিনি উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে চরিত্রসৃষ্টির জায়গাটিকে খুব মূল্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে যা কিছু বলতে চেয়েছেন, যা কিছু দেখাতে চেয়েছেন, যে জগতের সন্ধান দিতে চেয়েছেন সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি চরিত্রচিত্রণের উপর ভর করে অগ্রসর হয়েছেন। উপন্যাসের আয়তক্ষেত্রে অনিল ঘড়াই যা কিছু বলতে চেয়েছেন, যা কিছু বলার ঊর্ধ্বে রেখেছেন সমস্ত ক্ষেত্রে চরিত্ররাই তাঁর মূল কারিগর হয়েছে।

অনিল ঘড়াইয়ের লেখার মূল আলম্বন নিম্নবর্গের মানুষ। অন্ত্যজশ্রেণির জীবনভাবনা, অন্ত্যজ সমাজভাবনার উপর নির্ভর করে তিনি কথাসাহিত্যের নতুন ভুবন নির্মাণ করেছেন। আর এই নির্মাণকর্মে তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়েছে চরিত্র। এই চরিত্রেরা উঠে এসেছে অন্ত্যজসমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে। অন্ত্যজসমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পরিচয় দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর উপন্যাসের পরিসরে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র এসেছে। এই চরিত্রগুলির প্রকৃতি বিচার করলে দুই ধরনের চরিত্রের উপস্থিতি বেশি চোখে পড়ে তাঁর উপন্যাসে। দুই ধরনের চরিত্রের মধ্যে একদিকে রয়েছে বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, নারী-পুরুষ অন্যদিকে রয়েছে শিশু চরিত্র। এই দুইয়ের বাইরে অন্য কোনো চরিত্র যে নেই তা নয়, কিন্তু তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। উপন্যাসকার অনিল ঘড়াই প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে ওই দুই ধরনের চরিত্রের উপর নির্ভর করেই অগ্রসর হয়েছেন। যে যে উপন্যাসে যে যে শ্রেণির অন্ত্যজদের কথা বলেছেন সেই সেই শ্রেণি থেকে বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, নারী-পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি সেই সমাজ থেকে শিশু চরিত্রকেও তুলে এনেছেন। নারী-পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের অবস্থা তুলে ধরে লেখক প্রত্যেকটি অন্ত্যজশ্রেণির সামগ্রিক রূপটিকে, পূর্ণাঙ্গ অবয়বটিকে উদঘাটিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এইজন্য তাঁর উপন্যাসের অণুবিশ্বে বয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি শিশুচরিত্রগুলিও সমান গুরুত্বে আলোকিত হয়েছে। তাই শিশুচরিত্রগুলি কোনোরকম খামখেয়ালীপনা থেকে নয়, লেখকের গভীর ভাবনা থেকে, পরিকল্পিত মনন থেকে উঠে এসেছে, যার মধ্যে নিহিত আছে লেখকের বিশ্লেষণী মন, সুগভীর সমাজবোধ, অন্ত্যজ জীবন পরিক্রমা, অতলান্ত সমাজ সমীক্ষা, অখন্ড মানব চরিত্র অভিজ্ঞান।

উপন্যাসকার অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসের চরিত্রেরা কেউ শুয়োর পালক, কেউ মেথর, বাসের খালাসি, কাকমারা, চামার, তাঁতি, চোর, ভিক্ষাজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত অন্তেবাসী মানুষজন। ওই বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক মানুষেরা কোথায় থাকে, কীভাবে থাকে, কী খায়, কীভাবে বাঁচে প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের অনুপুঙ্খ বর্ণনা উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। যে সমাজের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরুন না কেন সেই সমাজের শিশুদের অবস্থা দেখাতে ভোলেননি লেখক। অন্ত্যজ সমাজভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের শিশুরা কী চরম

বিপন্নতার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে তার স্বরূপ উন্মোচনের প্রতি লেখকের অন্তরের একটা আগ্রহের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই শিশুরা চরিত্র হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। 'নুনবাড়ি' (১৯৯১) উপন্যাসে নোনাই, 'মুকুলের গন্ধ' (১৯৯৯) উপন্যাসে অর্জুন, 'বনবাসী' (১৯৯৪) উপন্যাসে লগন, 'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' (১৯৯৭) উপন্যাসে কুসমা, 'জন্মদাগ' (১৯৯৯) উপন্যাসে বাবলা-বেলে দত্ত, 'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১) উপন্যাসে কাকমারাদের ছেলেদের কথা, 'পাতা ওড়ার দিন' (২০০২) উপন্যাসে ভালুয়া, কুসুম, বায়ানী প্রভৃতি বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। এইভাবে অন্ত্যজ সমাজের শৈশব অবস্থা কম বেশি তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যেই একটা ভিন্ন মাত্রা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এবং এই চরিত্রগুলি উপন্যাসে নামেমাত্র থাকেনি। উপন্যাসের প্লট নির্মাণে চরিত্রগুলির বিশেষ তাৎপর্য লক্ষনীয়। উল্লিখিত উপন্যাসের আখ্যান রচনায়, উপন্যাসকারের জীবনভাবনার প্রকাশে শিশুচরিত্রদের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। চরিত্রগুলি কাহিনির গতি দানে, কোথাও আবার কাহিনির গতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে।

দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশা আর হাড়ভাঙা খাটুনিতে ভরা নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনের পুরোটা দেখাতে গিয়েই লেখক ওই সমাজের শিশুদের কথা তুলে এনেছেন। এই সমস্ত বয়ঃকনিষ্ঠ চরিত্রের রূপদানের ফলে অন্ত্যজসমাজের দরিদ্রপীড়িত, আর্তিক হাহাকারের রূপটি আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে। সমাজের যে শ্রেণির শিশুদের কথা বলুন না কেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাদের বিপন্নতার রূপটিই বড়ো পরিসর নিয়ে উঠে এসেছে। সমাজের অন্ত্যজদের শৈশব যে কত ভাবে সংকটগ্রস্থ, বিপন্ন, রুক্ষ, বিকাশহীন তারই অনুপুঙ্খ পাঠ দিয়েছেন লেখক উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়ে। এই চরিত্রেরা কেবলমাত্র বিপন্ন, বিকাশহীন, সংকটগ্রস্থই নয় সেই সঙ্গে তারা সহনশীলও বটে। অন্ত্যজসমাজের যে শ্রেণিকে দেখাতে চেয়েছেন সেই শ্রেণির শিশুদের অবস্থাকে দেখাতে ভোলেননি। ফলে অন্ত্যজসমাজের বাস্তব অবস্থার প্রখর রূপটি, সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

'মুকুলের গন্ধ' (১৯৯৩) উপন্যাসে মেথরদের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। জগেন-আন্নাকালী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এই চরিত্র দুটির পাশাপাশি আর একটি শিশুচরিত্র মূল্য সহকারে স্থান পেয়েছে। সে হলো অর্জুন, জগেন-আন্নাকালীর ছেলে। জগেন-আন্নাকালীর পাশাপাশি অর্জুন চরিত্রটি লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয়েছে। অর্জুনের বয়স খুব কম, সে একেবারে শিশু। শিশু হয়েও সে শৈশবের সমস্ত রকম চাওয়া-পাওয়া, স্নেহ-আদর থেকে পুরোপুরি ভাবে বঞ্চিত। চরম অর্থাভাব তার মতো মেথর পরিবারের ছেলেদের সমস্ত রকমের বঞ্চনার কারণ। পরিবারের চূড়ান্ত দারিদ্র্য তার শৈশবের সুখের, আয়াসের দিনগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে। দারিদ্র্যের করাল গ্রাস তার শৈশবের সমস্ত রকম কোমলতা, পেলবতাকে শুকিয়ে দিয়েছে এবং সীমাহীন হতাশা, যন্ত্রনা, রুক্ষতায় ভরিয়ে দিয়েছে তার শৈশবজীবনকে। পরিবার, পরিপার্শ্বিক সমাজ তাকে শুয়োরের বাগাল তৈরি করেছে। মেথর পরিবারে জন্ম বলেই জীবন যন্ত্রণার আগ্রাসন তার শৈশবকে রেহাই করেনি। জীবনে টিকে থাকার জন্য, পেটের জ্বালা, খিদের জ্বালা মেটানোর জন্য ছোটো থেকে তাকে বাগাল হয়ে শুয়োরের পালের পিছনে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। জীবন কী তা বোঝার আগেই তাকে

জীবন সংগ্রামে নেমে পড়তে হয়েছে। জগেন-আন্নাকালী জীবনে টিকে থাকার জন্য যতটা সংগ্রাম করেছে তাদের একমাত্র শিশু অর্জনকেও কোনো অংশে কম সংগ্রাম করতে হয়নি। তাই অর্জুন সম্পর্কে লেখক বলেছেন– "গ্রামে থাকলে সে (অর্জুন) একটা মুনিষ হোত, চাষী হোত, খুব বেশি হলে একজন পাকা সিঁদেল চোর। ...সে হয়েছে শুয়োরের বাগাল। জগেন জমাদার তার জন্য পুষে রেখেছে সাত সাতটা শুয়োর। সেই সাতটা জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার। যে সময়ে বাপ মায়েরা ছেলের হাতে শ্লেট-খড়ি ধরিয়ে দেয় ঠিক সেই সময় জগেন তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে পাচনবাড়ি।"[১]

মা-বাবা নিজেদের অর্থকষ্ট লাঘবের জন্য শুয়োর পুষেছে আর তার বাগাল করেছে অর্জুনকে। ফলে স্নেহ, ভালোবাসা, আদর – এসব কী জিনিস তা সে বোঝেই না, তার মতো মেথরের ছেলেদের জন্য ওইগুলো নয়। সকাল হওয়ার পর একঘেয়েমি ভাবে তার সারাদিন কাটে শুয়োরের পালের পিছনে ঘুরে ঘুরে। হাতে থাকে পাচনবাড়ি, পরনে গিঁট দেওয়া লুঙি। উদোম গায়ে রোদে রোদে ঘুরে হাত-পা-মুখ ঝলসে গেছে, শিশুসুলভ কোমলতার লেশমাত্র নেই। কোনো দিনের জন্য ভালো কিছু পরতে চাওয়া অথবা ভালো কিছু খেতে চাওয়া অর্জুনের মতো ছেলেদের কাছে স্বপ্নের সামিল। খাবার বলতে শুকনো মুড়ি অথবা রুটি আর গুড়। ওই সামান্য খাবার খেয়ে তাকে প্রতিদিন রোদে পুড়তে হয়, খিদেয় জ্বলতে হয়, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়। অর্জুনের এই করুণ চিত্রটি তুলে ধরেছেন লেখক –

"অর্জুন ইতস্তত পায়ে এগিয়ে গেল সামনে। তার চেহারার যা ছিরি হয়েছে, নিজের দিকে তাকাতেই ঘেন্না লাগে নিজের। শ্লেটের মত খড়ি ফোটা গা, চুল উলঝাল। হাতে পায়ে গা গতরে থোক থোক ময়লা। যেন জন্মদাগ। চওড়া বুকে কচি দুব্বোর চেয়েও ফিনফিনে লোম। সারাদিন নাওয়া - খাওয়া নেই, মুখমন্ডলে ছাপ পড়েছে ক্লান্তির, এমন কি চোখের কুচকুচে তারায় জড়তার বোঝা।"[২]

অনিল ঘড়াই দেখাতে চেয়েছেন এ রকম অনেক অর্জুন আছে যাদের নাওয়া-খাওয়া নেই, যাদের মুখে সর্বদা ক্লান্তি আর জড়তার ছাপ নিয়ে বড়ো হতে হয়। এদের জীবন এমনই অভিশপ্ত যে শিক্ষালাভ থেকে তারা পুরোপুরি বঞ্চিত। সমাজে অর্জুনের মতো ছেলেদের কাছে শিক্ষা এক অলীক বস্তু। অর্জুনের বয়সী ছেলেরা যখন বই হাতে স্কুলে যায় অর্জুন তখন শুয়োরের পাল নিয়ে মাঠে - মাঠে, ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণে, পরিবার-পারিপার্শ্বিকতার চাপে এদের জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হওয়ার আগেই শুকিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। অন্ত্যজসমাজের শৈশব অবস্থার জীবনবাস্তবতা এটাই। বাস্তবের এই কঠিন রূপটিকে লেখক তুলে ধরেছেন অর্জুনের মতো প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের রূপদানের মধ্য দিয়ে।

'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' (১৯৯৭) উপন্যাসে মুন্ডা, কোড়া, হো সম্প্রদায়ের মানুষের কথা উঠে এসেছে, যারা দৌড়বোনালায় কিংবা রংকুট পাথর চাট্টানে সোনা খোঁজার আজন্ম তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে আছে। লেখক এই অঞ্চলের বস্তি গুলোতে শৈশবের বিপন্ন অবস্থাকে দেখেছিলেন। তাই ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের যাপ চিত্র তুলে ধরা প্রসঙ্গে শিশুসমাজের করুন অবস্থার দিকটি দেখাতে ভোলেননি। চরম অর্থাভাবের কারণে এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের পরিধানের কাপড় জোটে না। ফলে ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা 'লেংটা', 'আধ-লেংটা' অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এটাই ওখানকার পরিচিত চিত্র, বাস্তব অবস্থা। এই অঞ্চলের শৈশবজীবন এই

ভাবেই নগ্ন, অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় কাটে। এখানেও লেখক দেখাতে চেয়েছেন ওই অঞ্চলের অন্ত্যজসমাজের শৈশব সমানভাবে অবহেলিত, চরমভাবে অসহায়।

আদিবাসী প্রধান বস্তিজীবনে ঝগড়া, খিস্তি খেউড় অবিরাম চলতে থাকে। শিশুরা ছোটো থেকেই এই জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ায় তারাও কথায় কথায় গালিগালাজ দিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তার অর্থও তারা বোঝেনা, কিন্তু বড়োদের অনুসরণ করে ছোটোরা গালিগালাজ দিতেও ভোলে না। গালি দিয়ে কথা বলাটাই তাদের রেওয়াজ। লেখক নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন এই অঞ্চলের শিশুদের জীবনেও না পাওয়ার তালিকাটাই দীর্ঘ। দুবেলা পেট ভরে খেতে না পাওয়া, পরনের পোশাক না পাওয়া তো আছেই; এমনকি মা-বাবার কাছ থেকে স্নেহ ভালোবাসাও সেভাবে জোটে না। ছেলেবেলা থেকেই এদের জীবন ধীরে ধীরে রুক্ষতায়, কঠোরতায় ঢেকে যেতে থাকে। এর পাশাপাশি দেখা যায় আদিবাসী এলাকা হওয়ায় 'হাঁড়িয়া'র প্রতি আসক্তি ওই অঞ্চলের মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বড়োদের দেখাদেখি ছোটোরাও হাঁড়িয়া খাওয়া শুরু করে দেয় শিশুকাল থেকেই। শৈশবকাল থেকেই এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা হাঁড়িয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাবে শিশুকাল থেকে এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জীবন কীভাবে বিপন্ন, কীভাবে অভিশপ্ত হয়ে পড়ে তা লেখক নিজের চোখে দেখেছিলেন। একদিকে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব অন্যদিকে হাঁড়িয়ার প্রতি প্রবল আসক্তি – এই দুয়ের প্রভাবে রংকুট, দৌড়বোনালা অঞ্চলের শিশুসমাজের করুণ পরিণতির দিকটি লেখকের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত হয়ে শিল্পরূপময় হয়ে উঠেছে।

দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশায় কাতর সমাজের বিপন্ন শৈশবের আর এক মর্মস্পর্শী রূপ উঠে এসেছে 'জন্মদাগ' (১৯৯৯) উপন্যাসে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জগন্নাথ, যে হাসপাতালের মেথর। এই মেথরদের জীবনের সামগ্রিক রূপ দেখাতে গিয়ে লেখক ওই সমাজের শৈশব অবস্থাকে দেখাতে ভোলেননি। জগন্নাথ-রমার একমাত্র সন্তান বাবলা, তাকে ঘিরে লেখকের শৈশব জীবনভাবনা একটা বড়ো পরিসর জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাবা রোগা হওয়ায়, পরিবারে উপার্জনশীল আর কেউ না থাকায় অতি অল্প বয়সে বাবলার উপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে চাপে। চরম দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া শেখার সুযোগ সে হারায়। সংসারের দায়িত্ব সামাল দিতে গিয়ে তার শৈশব পিষ্ট হয়েছে; সীমাহীন দারিদ্র্য তার শৈশবের সৌন্দর্য, মাধুর্যকে গ্রাস করেছে। বাবলার মতো ছেলেদের শৈশবের করুণ অবস্থাটির চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক বাবলার জবানিতে –

"আমার বাবা-মা আমাকে পড়াশোনা শেখালো না। জ্ঞান পড়ার পর থেকে গোয়াড়ী বাজারে গ্যারেজের কাজে ঢুকিয়ে দিল। মাস গেলে পঁচিশ টাকা মাইনে পেতাম তখন। সেই পঁচিশ টাকা বাবার হাতে দিতে হোত। কেননা বাবা একদম খাটাখাটনি করতে পারত না। বাবা ছিল চির রুগন। ফলে একটু বড় হতেই সংসারের সব দায় - দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। সেই চাপ কাটিয়ে আমার আর পড়াশোনা করা হলো না। কখন যে পড়াশোনা করার বয়সটা পেরিয়ে গেল আর বুঝতেই পারলাম না।"[৩]

সমাজের অন্তেবাসী মানুষদের অভিশপ্ত শৈশবের স্বরূপটি উপরের কয়েকটি লাইনে মর্মগ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। বাবলাকে প্রতিনিধি করে লেখক শৈশব অবস্থার চরম অবহেলিত রূপের যে বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা আমাদের অবাক করে। বাবলার মতো ছেলেদের জীবন শুরু থেকেই একের পর এক 'না' তে

ভরা। এদের জীবনে না আছে শিক্ষা, না আছে স্নেহ, না আছে খেলাধুলার অবসর, না আছে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার সামর্থ্য। বাবলার মতো ছেলেদের শৈশব শুরু থেকেই নঞর্থকতায় ভরা, সীমাহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত।

জীবনে আমোদ-প্রমোদ, বিলাস, হই-হুল্লোড় কী জিনিস তা বাবলার মতো ছেলেরা জানতেই পারে না। শৈশব থেকেই এদের জীবন একঘেয়েমিতায় ভরা। ছোটো থেকে একই খাবার খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে বাবলা বলেছে – "রোজ রোজ ডাল ভাত খেতে আমার ভালো লাগে না। খেসারির ডালে কোন স্বাদ পায় না।"[৪]

স্বাদ না পেলেও ওই খাবারই তাকে প্রতিদিন বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছে। জীবনে কোন চাওয়ায় তাদের মেটে না, সামান্য খাবারটুকুও নয়। চরম অনটনের কারণে বাবলার মধ্যে শিশুসুলভ সুকুমার বৃত্তি গুলি হারিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। শিশু হওয়ার সত্বেও খেলাধুলা করার অবসরটুকু সে পায় না। এমনকি ইচ্ছা থাকলেও তা পারেনা পরিস্থিতির চাপে পড়ে, পারিবারিক দুরাবস্থার কারণে। উপন্যাসে বাবলাকে প্রতিনিধি করে লেখক নিরুপায়, অসহায় শৈশবের চিত্র তুলে ধরেছেন – "হঠাৎ কোথা থেকে নয়ন এসে হাজির, 'বাবলা, গুলি খেলতে যাবি না? এই দেখ কত জল রঙের গুলি এনেছি। বাবলা ধাড়ী ছাগল দেখিয়ে বলল, 'যাব না রে, ছাগল চরাতে এসেছি। ছাগলের পেট না ভরলে মা বকবে।"[৫]

কেবল নিম্নবর্গের মানুষরাই নয়; তাদের ছেলেমেয়েরাও কতটা বন্দী, কতটা শৃঙ্খলিত, কতটা যন্ত্রণাকাতর তার বাস্তব রূপটিকে তুলে ধরেছেন বাবলাকে প্রতিনিধি করে। শত কষ্ট-যন্ত্রণা সত্ত্বেও অন্ত্যজসমাজের শিশুরাও ছোটো থেকে কতটা সহনশীল তার বিবৃতিও দিয়েছেন লেখক। এই সমাজের ছেলেমেয়েরা ছোটো থেকে এইভাবে সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করে নেওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে 'জন্মদাগ' উপন্যাসে লেখক বাবলাকে দিয়ে বিপন্ন শৈশবের অভিশপ্ত অবস্থার করুন রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

বাবলার মতো ছেলেদের দুঃখ এখানেই শেষ নয়। ছোটো থেকেই তার স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতির দিকে ঝুঁকতে থাকে। যত দিন যেতে থাকে বাবলা আরও শুকিয়ে যেতে থাকে। সন্ধ্যা নামলেই সে ঝিমোয়, ঘুম ঘুম পায় তার। এই চরিত্রটির দুঃখ-যন্ত্রণা-কাতরতাকে আরো অনুভববেদ্য করে তোলার জন্য এই চরিত্রটির বৈপরীত্য সূচক আর একটি চরিত্র পাশাপাশি ভাবে কাহিনি মধ্যে এনেছেন লেখক। সেই চরিত্রটি হল কেলে দত্তের ছেলে বেলে দত্ত। বেলে দত্তের শৈশব আদর, আব্দার, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে মোড়া। ধনী পরিবারের ছেলে বেলে দত্ত যা চায় তার দশগুণ বেশি জিনিস পায় পরিবারের কাছ থেকে। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন–

"কেলে দত্তর ছেলে বেলে দত্তর আব্দারের শেষ ছিল না"[৬]

এখানে 'আব্দার' শব্দটা লক্ষনীয়। এই শব্দটি ব্যবহারের দ্বারাই বাবলা এবং বেলে দত্তর শৈশব অবস্থার আসমান জমিন ফারাককে সূচিত করেছেন। লেখক দেখাতে চেয়েছেন আদর-আব্দার এগুলো বাবলার মতো অন্ত্যজ সমাজভুক্ত ছেলেদের জন্য নয়; এগুলো বেলে দত্তের মতো ছেলেদের জন্যই। কেবল এক্ষেত্রেই নয়; বাবলারা জীবনের সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত, তারা জীবনে কেবল ত্যাগ করেই চলে। আর বেলে দত্তরা কেবল

ভোগ করেই যায়। তারা মা-বাবা, পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে কেবল পেয়েই যায়, নিয়েই যায়, দেয় না কিছুই। অন্যদিকে বাবলারা পরিবারকে কেবল দিয়েই যায়, পায় না কিছুই। বেলে দত্ত চরিত্রটির তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থাপনার ফলে বাবলা চরিত্রটির করুন অবস্থা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

'পাতা ওড়ার দিন' (২০০২) উপন্যাসে বিপন্ন শৈশবের আর এক ভুবনের সন্ধান দিয়েছেন লেখক। যারা পিচের রাস্তা তৈরি করে সেই শ্রমিকদের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে থাকা শিশু শ্রমিকদের জীবনবৃত্তান্তকে বিবৃত করেছেন কথাকার অনিল ঘড়াই এই উপন্যাসের আখ্যানভাগে। ভানুয়া, কুসুম, বায়ানী – এরা রাস্তায় কাজ করা শিশু শ্রমিকদের প্রতিনিধি। চরম অর্থাভাবের তাড়নায় এরা বাধ্য হয়ে রাস্তা তৈরির কঠোর শ্রমনির্ভর জীবনকে গ্রহণ করেছে। রাস্তাতেই এদের জন্ম, রাস্তাতেই এদের বড়ো হওয়া। কখনো রাস্তার ধারে, কখনো ফাঁকা মাঠে, কখনো জঙ্গলের পাশে, কখনো আবার দুর্গম এলাকায় পড়ে থেকে এদের দিন কাটে। শিক্ষা তো অনেক পরের কথা জীবনে বেঁচে থাকার ন্যূনতম জিনিসগুলো সবসময় ঠিকঠাক জোটে না তাদের। শিশু হওয়ার সত্ত্বেও আমোদ - আল্লাদ, আবদার, খেলাধুলা – এগুলোর স্বাদ তারা কখনো পায়নি। তারা জীবনে একটা জিনিসই জানে। সেটা হল কঠোর পরিশ্রম করা। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার সত্ত্বেও মালিকের কাছ থেকে 'ঝাড়' গালিগালাজ খেতে হয়। এটাই তাদের নিত্য দিনের প্রাপ্তি। এদের জীবনের ভয়ংকর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক –

"এই কালো পিচ কোনমতে কাল কেউটের বিষের চেয়ে কম নয়, গায়ে এসে পড়লে লোম শুদ্ধু চামড়া উঠিয়ে ছাড়ে। আর ফোসকা পড়লে ঘা শুকোতে সময় নেয় মাসের উপর। গরম পিচ গায়ে পড়লে চাম - মাংস জড়িয়ে নিয়ে উঠে আসে।"[৭]

সমাজের কোনো একটা শ্রেণির শৈশব এই রকম ভয়ংকরতার মধ্য দিয়ে কাটে – এটা ভাবতেও অবাক লাগে। সমাজের এই রকম একটা বিপন্ন শৈশবের বাস্তব অবস্থাকে লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এনেছেন।

সুখের চাইতে এদের জীবনে ঢের অশান্তি। আর এই অশান্তির সূচনা শৈশব থেকে শুরু হয়ে যায়। শিশুকাল থেকে এরা চরম দাবদাহে দগ্ধ হতে থাকে। একদিকে ফাঁকা রাস্তায় সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হওয়া অন্যদিকে গরম পিচে দগ্ধ হওয়া – এই দ্বিবিধ দগ্ধে এদের জীবন শুষ্ক, নীরস, ভাবলেশহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া জঠোরের আগুনে দগ্ধ হওয়া তো আছেই। এইভাবে দগ্ধ হতে হতে এদের শৈশবের কোমলতা, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি শুকিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়া, লেখাপড়া শেখা এদের কাছে স্বপ্নের সামিল। শিশুকাল থেকে অন্নচিন্তা করেই এদের দিন কাটে। অন্নহীন দুঃখ দারিদ্রে নিষ্পেষিত হতে থাকে এদের শিশু কাল। সীমাহীন অন্ধকারে ঢাকা এদের শৈশব। লেখকের অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবন বৃত্তান্তটি হল – "আমাদের হরদিন তো রাতের চেয়েও আঁধার"[৮]

অন্ত্যজসমাজভুক্ত এইরকম শ্রেণিও আছে যাদের শৈশব পর্বতপ্রমাণ বঞ্চনা, অবজ্ঞা আর সীমাহীন অন্ধকারে পতিত। এই শ্রেণির মানুষদের জীবন, তাদের জীবনের শৈশব অবস্থার কঠিন, কঠোর বাস্তব রূপকে

একেবারে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন। কল্পনা বিলাসী রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে রেখে বাস্তবের কঠিন রূপটিকে তুলে ধরেছেন ভানুয়া, কুসুম, বায়ানী প্রভৃতি চরিত্রের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে।

এই সব উপন্যাস ছাড়াও 'নুনবাড়ী' (১৯৯১), 'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১), 'অনন্ত দ্রাঘিমা' (২০০৯) প্রভৃতি উপন্যাসেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণির শৈশব অবস্থাকে তুলে ধরেছেন লেখক। ওইসব উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত শৈশবও নানা ভাবে সংকটগ্রস্থ, হতাশাগ্রস্থ, বিপন্ন।

কথাকার অনিল ঘড়াই অন্ত্যজ সমাজের এক-একটি শ্রেণির জীবনচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি সেই সমাজের শৈশবকে দেখিয়েছেন। এই শৈশবকে দেখাতে গিয়ে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি পরিচিত চিত্র উঠে এসেছে। সেটা হল প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শৈশব অবহেলিত, পীড়িত, লাঞ্ছিত, বিপন্ন। এই বিপন্নতা কেবল একটি মাত্র দিক থেকে নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, খাদ্য, পোশাক প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই বিপন্ন শৈশবের স্বরূপটি উঠে এসেছে। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শৈশব কঠোর, কঠিন সংগ্রামে নিমজ্জিত। অন্ত্যজ সমাজভুক্ত শিশুরা বেঁচে থাকার জন্য শৈশব অবস্থা থেকেই সংগ্রামী হয়ে উঠে পরিবেশ, পরিস্থিতির কারণে। তাই এই সব শৈশব কোমলতা, পেলবতাকে হারিয়ে রুক্ষতাকে সঙ্গী করে বড়ো হয়। অন্ত্যজসমাজের শিশুদের রুক্ষতা সর্বস্ব, কঠোর জীবনচিত্র সম্বলিত বাস্তবতা অনিল ঘড়াইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর উপন্যাসে অন্ত্যজসমাজের দারিদ্রপীড়িত, আর্তিক হাহাকারের যে রূপ উঠে এসেছে তা আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে ওই সমাজের শিশুচরিত্রের রূপদানের মধ্য দিয়ে। নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনসমীক্ষা দিতে গিয়ে লেখক কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক চরিত্রের রূপদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, সেই সঙ্গে ওই সমাজের বয়ঃকনিষ্ঠ চরিত্রের উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে অন্ত্যজ জীবন পরিক্রমার পূর্ণ বলয়টিকে, অখণ্ড ইতিবৃত্তকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তিনি শিশুচরিত্র গুলির স্বরূপ তুলে ধরেছেন; পরতে পরতে চরিত্রগুলির মর্মের জায়গা গুলি মেলে ধরেছেন। শিশুচরিত্র গুলি আখ্যানের মধ্যে নাম মাত্র হয়ে অথবা পার্শ্ব চরিত্র হয়ে না থেকে লেখকের অখন্ড জীবনভাবনা প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে শিশুচরিত্রের নিখুঁত রুপায়নের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যাপ্ত, সুপ্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিশুচরিত্র গুলি তাঁকে কথাসাহিত্যের নতুন ভুবনের দিশারী করে তুলেছে।

এই চরিত্রগুলিকে আখ্যানের মধ্যে এনে লেখক এক ঢিলে অনেক পাখি মেরেছেন। অন্ত্যজসমাজের অসহায়তার স্বরূপ, অবহেলিত অবস্থার গভীর রূপটিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসে শিশুচরিত্র গুলির ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। দুঃখ - যন্ত্রণা - হতাশা আর হাড়ভাঙা খাটুনিতে ভরা জীবনের পুরোটা দেখাতে গিয়েই লেখক কাহিনির মধ্যে শিশু চরিত্র গুলির স্থান দিয়েছেন। নিম্নবর্গভুক্ত মানুষদের জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা, বৈষম্য শিশুকাল থেকে কীভাবে সহ্য করে বড় হতে হয় তার স্বরূপ তুলে ধরার জন্যই লেখক একাধিক শিশুচরিত্রের পরিকল্পনা করেছেন। আর এই শিশুচরিত্র গুলির রূপায়ণের মধ্য দিয়ে লেখকের গভীর অতলান্ত জীবনভাবনার, সমাজ বিশ্লেষণী বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্ত্যজজীবন সম্পর্কে উপন্যাসকার অনিল ঘড়াইয়ের জীবনবোধ কতটা গভীর এবং ব্যাপ্ত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় শিশুচরিত্র গুলির

রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। জীবনের প্রতি দীর্ঘশ্বাস আর বঞ্চিতদের প্রতি সমবেদনা থেকেই তাঁর রচনায় দীর্ঘ পরিসরে শিশু চরিত্ররা উঠে এসেছে।

উপন্যাসকার অনিল ঘড়াইয়ের সুগভীর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর উপন্যাস-গল্পে শৈশবচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। শৈশবচেতনা লেখকের জীবন চেতনারই একটা অঙ্গ হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। "অর্জুনের মতো প্রত্যেকটি চরিত্র লেখকের গভীর অন্ত্যজ সমাজভাবনা থেকে উঠে আসা চরিত্র। অর্জুন অনিল ঘড়াইয়ের নব আবিষ্কার, অভিনব সৃষ্টি অন্ত্যজজীবন সমীক্ষার প্রেক্ষাপট বিচারে।"[৯] এই শৈশবভাবনা কথাশিল্পী অনিল ঘড়াইয়ের সমাজভাবনার আর একটা রূপ। এই শৈশবচেতনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসকারের ব্যাপ্ত জীবনবোধ, সামগ্রিক জীবনবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অখন্ড জীবনপ্রত্যয়ের অধিকারী ছিলেন বলেই লেখক বয়ঃপ্রাপ্ত চরিত্রের পাশাপাশি বয়ঃকনিষ্ঠ চরিত্রগুলিও সমান মর্যাদায় অঙ্কন করেছেন। অখন্ড জীবনচেতনা থেকে তিনি সমাজের নানা স্তরের অন্ত্যজদের শৈশব অবস্থার করুন, অসহায় দশার শিল্পিত পরিমণ্ডল দান করেছেন। অন্ত্যজ সমাজের মানুষদের প্রতি অসীম ভালোবাসা, নিবিড় মমত্ববোধ থেকে তাঁর উপন্যাসে শিশু চরিত্রগুলি সমান মর্যাদায়, সমান মূল্য পেয়ে রুপ লাভ করেছে, যা লেখকের একক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উঠে আসা ঐক্যবদ্ধ জীবন ভাবনার ফসল।

তথ্যসূত্র:-

১) ঘড়াই অনিল, 'মুকুলের গন্ধ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.- ১৬
২) ঐ, পৃ.- ৭১
৩) ঘড়াই অনিল, 'জন্মদাগ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ.- ১২
৪) ঐ, পৃ.- ৫৭
৫) ঐ, পৃ.- ৮২
৬) ঐ, পৃ.- ১১৪
৭) ঘড়াই অনিল, 'পাতা ওড়ার দিন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ.- ১০
৮) ঐ, পৃ.- ৩৫
৯) মন্ডল দীনবন্ধু, 'সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন', আশাদীপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ.- ১৩১